বাংলার দান্তে — বিনয় মজুমদার

তীর্থঙ্কর মৈত্র

শ্রদ্ধেয় কবি বিনয় মজুমদারের বাংলা কাব্য জগতে পদার্পণের কাল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কাল। এটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার, চিন্তাজগতে চিন্তাবিদদের বিশেষ কিছু মতবাদ, যা আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল য়ুরোপে। যার ঢেউ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় এজরা পাউন্ডের আধুনিক কবিতা আন্দোলনের ফলে জীবনানন্দ দাস, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবির আবির্ভাব ঘটে। এ সময়ে বাংলা কবিতার রক্ত মাংসে য়ুরোপীয় এই কাব্য আন্দোলনের ঢেউ যতটা লেগেছিল, তা সঞ্চারিত হতে দেখা যায় ৫০শের কবিকুলের মধ্যে। কবি বিনয় মজুমদার এই ৫০ দশকের একজন। রবীন্দ্র পরবর্তী দীর্ঘ শৈত্যপ্রবাহে যে তাঁবু ফেলেছিলেন আধুনিক আন্দোলনকারী প্রথমার্ধের কবিগণ, সেখানে এই নবীন কবিরা আগুনের ব্যবহার এবং আধুনিকতার যৌবনপ্রাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। কবি বিনয় মজুমদার এ সময়ে অবস্থান করলেও পাউন্ড মন্ত্রের দীক্ষার সেই শর্তাবলি কতটা মেনেছিলেন?

আধুনিক কবিতা আন্দোলনের মূল, পুরাতনকে বর্জন। দ্বিতীয়ত পুরনো ছন্দপরিহার Verse libre বা মুক্ত ছন্দগ্রহণ। তৃতীয়ত, সমসাময়িক শব্দপ্রয়োগ। চতুর্থত, রোমান্টিসিজমের ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগে অতি তরলীকরণ থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। আমরা বিনয়কে পাই কয়েকটি ক্ষেত্রে ঠিক এর উল্টো রূপে। তার সমসাময়িক বন্ধুরা যখন সমসাময়িক শব্দ প্রয়োগে ব্যস্ত, বিনয়কে তখন ফিরে তাকাতে দেখি তৎসম ঘেঁসা শব্দের দিকে। অর্থাৎ শব্দে তিনি বেছে নিলেন পুরনোকে। দ্বিতীয়ত, Verse Libre-এর পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করতে দেখি প্রচলিত পয়ার ছন্দ। পুরাতন কবিদের বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় আদিকবিদের অনেকাংশে অনুসরণ করলেন।

বরং তাকে পাই বিংশ শতকের কবি ও নাট্যকারগণের মতো করে। যারা এড্‌গার এলান পো, ইতালীয় মহাকবি দান্তে, সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের ডন প্রভৃতি মেটাফিজিক্যাল কবিগণ ওয়েবস্টার প্রভৃতি ইংরেজ নাট্যকারগণের ভেতর থেকে আধুনিকতার অনেক সূত্র প্রযোজন মতো গ্রহণ করেছিলেন।

পো'র মন্ত্রপূত উচ্চারণ পরিলক্ষিত হয় বিনয়ের ক্ষেত্রেও। কারো কারো মতে আধুনিক কবিতা আসলে রোমান্টিসিজম ও ক্লাসিজমের মিশ্রণ। এখানেও কিন্তু 'ফিরে এসো চাকা'র সুরটিকে মনে করায়। টি. এস. এলিয়ট' ও অন্যান্যদের কবিতা ও প্রবন্ধে যে ধারণাটি পাওয়া যায়, তার সঙ্গেও মিল খুঁজে পাই। অর্থাৎ রোমান্টিক ব্যক্তিবাদের দুর্বল অতিরেককে ক্লাসিসিজমের নৈর্ব্যক্তিক দ্বারা শোধনও তার কবিতায় দেখা যায়।

পাউন্ড কিংবা তাঁর শিষ্য এলিয়ট্ বলেছিলেন — 'কবিতাকে আবেগের তরলীকরণ থেকে মুক্ত হতে হবে। সহজপাঠ্য ভাব ভাষা - ছন্দের বিরুদ্ধে তাদের যে বিদ্রোহ, বিনয়ের প্রথম দিকের কবিতায় অর্থাৎ 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' বা তার পরবর্তীকালের কিছু কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত এমন বিরুদ্ধ ভাবনা থাকলেও তিনি অত সহজপাচ্য নন, যা তার বিষয় ও উপমা প্রয়োগের জন্য এমন এক স্থানে পৌঁছেছেন। অবশ্য 'আমাদের বাগানে' কাব্যগ্রন্থ থেকে তাকে এই ধারণার বিপরীতে হাঁটতে দেখা যায়। এখানেও প্রচলিত পয়ারে জটিল বিষয়কে দুই চোখে দেখা, লতা-পাতা-ফুল-পাখি-মানুষ ইত্যাদি প্রয়োগে শিশুর আহার্যের মতো' সরল তরল করে তুলেছেন। এই সরল - তরলীকরণের চাওয়াটি যে 'আমাদের বাগানে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেও ছিল, এটা বোঝা যায় তার 'ফিরে এসো চাকা'র কাব্যগ্রন্থের একটি পংক্তির মধ্য থেকে।

> ''শিশুদের আহার্যের মতোন সরল হও তুমি,
> সরল, তরল হও; বিকাশের রীতি - নীতি এই।"

কবি বিনয় মজুমদারকে জীবনানন্দের দ্বারা প্রভাবিত বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি নানা সময়ে আড্ডার ছলে আমাদের জানিয়েছেন, — 'আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, জীবনানন্দের মতো কবিতা লিখতে, কিন্তু পারিনি।' এধরনের কথার ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কারো মতো কারুরই লেখা সম্ভব নয়। কারণ, কারো দেখার সঙ্গে কারো দেখার মিল ঘটেনি। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি আছে। এই প্রকৃতিতেই তার ঘোরা - ফেরা, দর্শন যা কিছু তা, তার নিজস্ব এই প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে। যার জন্য একই স্থানে দাঁড়িয়ে, একই বস্তু দেখার ফল কিন্তু ভিন - ভিন্ন মনে ভিন্ন - ভিন্ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতএব, কবি বিনয় মজুমদার যে প্রকৃতিগত ব্যবধানে কবি জীবনানন্দের মতো লিখতে পারেন নি, তা ঠিক।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই 'প্রভাব' বিষয়কে নানাভাবে চিন্তা করেছি এবং বোঝবার চেষ্টা করেছি কি কি মাধ্যমে কজন কবি প্রভাবিত হতে পারেন। ১) শব্দ দ্বারা, ২) বিষয় দ্বারা, ৩) নির্মাণ পদ্ধতি দ্বারা, ৪) দর্শন দ্বারা ৫) ছন্দ দ্বারা ৬) উপমা দ্বারা ৭) অলংকার দ্বারা ৮) কথনভঙ্গি দ্বারা ৯) চিত্রকল্পদ্বারা। কিন্তু যিনি মৌলিক কবি তিনি এসবের ঊর্ধ্বে, কারণ তার স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রকৃতি এগুলি নির্ধারণ করে দেয়। এই 'ব্যক্তি প্রকৃতির' সঙ্গে যতটুকু মিল পাওয়া যায়, ততটা একইরকম হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এক্ষেত্রে আমাদের দেখে নেওয়া দরকার বিনয়ের ব্যক্তিপ্রকৃতি ও জীবনানন্দের ব্যক্তি প্রকৃতিকে, যে ব্যক্তি প্রকৃতি দুই ভিন্ন চরিত্রের জন্ম দিয়েছে, তাদের সাদৃশ্য কতটা। এই চরিত্রই একজন কবির কাব্যভাষা, দর্শন ইত্যাদির জন্ম দেয়। বলে রাখা প্রয়োজন, এই প্রকৃতি গঠনে বহির্প্রকৃতির অবদান থাকে।

বিনয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। বিনয়ের জন্ম বর্মায়, শৈশবে বর্মার জলবায়ু এবং নিসর্গ তাঁর শরীরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অথচ তিনি জানতেন বাংলাদেশে ফরিদপুরই তাঁর পূর্বপুরুষের আদি বাসভূমি। জীবনানন্দের নদীমাতৃক বরিশালে জন্ম। জল, নদী, ধান, নৌকো ইত্যাদি তার দেশ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার শরীর ও মনের গঠন তৈরি করেছে। ভারতে অবস্থানকালেও তার মাতৃভূমির জন্য ক্রন্দন ও প্রবাসীবোধ ছিল। বিনয় সাত বছর বয়সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার হয়ে, অনেক ধ্বংস ও অনেক মৃত্যু দর্শন করতে - করতে পায়ে হেঁটে ভারতে আসেন। এই বয়সে তিনি অনাহার ও মৃত্যু ভয়ের মধ্যে দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন অন্য এক রূপে। ভারতে স্থায়ী বসবাস হলেও পূর্বপুরুষের বাসভূমির প্রতি এক টান কোথায় যেন রয়ে যায়। তাই তার প্রকাশ্যে সীমান্ত অস্বীকার এবং বাংলাদেশে প্রবেশ ও কারাবাস। পরবর্তীতে পূর্বপুরুষের ভূমিতে যান। এক মুসলিম পরিবারে আশ্রয়গ্রহণ ও তার ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে থাকা ও কাওয়ার ব্যবস্থা হয়। পুনরায় ভারতে ফিরে আসা। এযেন তার 'ফিরে এসো চাকায়' বর্ণিত সেই বিপন্ন মরাল। যে অবিরাম পলায়নকারী, যার পালকের নীচে রয়েছে উষ্ণ মেদ আর মাংস। অর্থাৎ এই সৃষ্টিশীল মানুষটির আলালিত সেই স্বপ্নের পূর্বপুরুষদের ভূমিতে স্থায়ী বসবাস করা সম্ভব হলো না। স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেন এমন এক স্থানে

যা ফরিদপুর কিংবা বর্মার মতো নয়। জীবনানন্দ ইতিহাস চেতনা ও বিশ্বের ভয়ংকর দর্শনে ক্লিষ্ট বেদনার্ত প্রাণ। বিনয় গণিতের স্রষ্টা। তার দর্শনগুলো গণিতের দ্বারা সত্যতা যাচাই করে নিয়েছে। এভাবে যদি আমরা আরো অগ্রসর হই, বিনয় এবং জীবনানন্দের চরিত্র গঠনে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে তাদের নিজস্ব প্রকৃতি যেভাবে গঠন করে নিয়েছিল তাদেরকে তাতে দুজনেরই বিস্তর দূরত্ব মিলবে। অতএব, এমন দুই চরিত্রের ভাষা দর্শন ইত্যাদি পৃথক হতে বাধ্য।

এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ইয়েটস্ ও জীবনানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। ইয়েট্সের জন্ম হয়েছিল কৃষিপ্রধান আয়ারল্যান্ডের নিভৃত পল্লীগ্রামে। শৈশব থেকে লোকগাথা রূপকার ইত্যাদি গ্রাম্য শিল্প সংস্কৃতি শুনে - শুনে তৈরি হয়েছিল তার মন - প্রাণ। রহস্য ও অশরীরী আত্মার প্রতি আকর্ষণ ছিল পরিপূর্ণভাবে এবং এই গ্রাম্য প্রকৃতির প্রতি ছিল তার প্রবল টান। অন্যদিকে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে একই রূপ - অবস্থা দেখা যায়। একদিকে সৌন্দর্যময় গ্রাম্য প্রকৃতি, লোকগাথা, রূপকথা যা শৈশবে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল। অন্যদিকে অশরীরী ও ভূতপ্রেতের অনুভব এবং রূপসী বাংলায় তার প্রকৃতির প্রতি যে অদম্য টান ছিল, সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। ইয়েট্সে যেমন পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা পাই অর্থাৎ ধ্বনি, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি তার কবিতা পাঠে অনুভূত হয়। জীবনানন্দের কবিতা পাঠে একই রূপ পাই। উভয়ের কবিতায় খড়, ইঁদুর, নদী, মাঠ, হেমন্ত, পেঁচা ইত্যাদি অনুষঙ্গ দেখা যায়। তা কিন্তু একই ধরনের প্রকৃতিতে বসবাসের কারণ, অর্থাৎ তার পরিবেশ প্রকৃতির দ্বারা গঠিত চরিত্রস্থিত মননের জন্য। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি বিনয়ের 'আত্ম পরিচয়' অংশের দিকে তাকাই তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

'...ইংরেজি ক্লাসিক্যাল কবিদের বই আমি প্রায়শই লাইব্রেরি থেকে নেমে পড়তাম। সেই বয়সে তাদের কবিতা আমার ততো ভালো লাগতো না। আবার মনে হচ্ছে, বয়স কম বলে অমন হতো— একথা বোধহয় ঠিক লিখিনি। কারণ তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে আমার ভালো লেগেছিল, 'প্রান্তিক' নামক ছেটো বইখানি। এখনো আমার ঐ বইখানিই সবচেয়ে ভালো লাগে। বয়স বাড়ার ফলে আমার সে অল্প বয়সের ভালো লাগা পাল্টায়নি।

যা হোক আমি নিজে কী লিখতাম সেইটেই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'বিষয়বস্তু' লিখেই মনে পড়লো কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হচ্ছে একটি ভালো বিষয়বস্তু মনে আসা। তখনকার বিষয়বস্তু ছিল অধিকাংশ কাল্পনিক — এ -কথা আগেই লিখেছি। শহরের দৃশ্যাবলী পথঘাট মাঠ বাড়ি — এ-সকল আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে আসতো না। বিষয়বস্তু হোত না। এতদিন পরে এখন কিছু কিছু লিখতে পারি।...'

এই যে কিছু পারেন বলে জানাচ্ছেন, এ পারাটা তার 'অঘ্রানের অনুভূতি মালা' বা তার 'আমাদের বাগানে'র থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। যা জীবনানন্দে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তিনি যে কেবল বিষয় খুঁজতেন তার প্রাপ্তিটা কিভাবে ঘটে দেখে নেওয়া যাক।

...'সেই কলেজে পাঠকালে ভাবতাম কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক, আর কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক নয়। এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা তেমন নয়। সব বিষয়বস্তুই কাব্যিক এবং যাঁর দৃষ্টিতে এই কাব্যিকতা ধরা পড়ে, তিনিই কবি। এমন কি, চিন্তা করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ-সব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের গোড়া থেকে। তার আগে জানতাম না।'...

(আ: প: কাব্য গ্র:)

আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন ১৯৬০ খৃঃ মানে বিনয়ের প্রথম কাব্য গ্রন্থ, 'নক্ষত্রের আলোয়' প্রকাশের ঠিক এক বৎসর পরের কতা। অর্থাৎ 'গায়ত্রীকে' রচনার কাল। যার প্রকাশ কাল ১৯৬১।

উপরের এই উক্তির ভেতর থেকে যে ধারণা জন্মে সেগুলি এরকম — প্রথমত তিনি ইংরাজি ক্লাসিক পড়তেন কিন্তু তার ভালো লাগতো না। অতএব যা ভালো না তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হয়ত — গ্রামে আসতেন কিন্তু গ্রামের বিষয়বস্তু তাঁর কবিতায় আসতো না; এখানে লক্ষ্য করবার, বিনয় বিষয় খুঁজছে, আর জীবনানন্দ প্রকৃতির সৌন্দর্যে মগ্ন : বিনয় এই গ্রাম্য প্রকৃতিকে তার পদ্ধতি বা সমস্ত শিক্ষার আধার রূপে গ্রহণ করেছেন। যেখানে বিনয় জীবন ও জগতের সত্য অনুসন্ধানী। জীবনানন্দ সেখানে অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক যেন। অন্যাদিকে তাকে পাই প্রকৃতির সৌন্দর্য - বিভূতি জড়িত আকারে। বিনয় সেখানে ঐ বিভূতির প্রকৃত স্বরূপ জানেন যেন, তাই ঐ মোহ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। অতএব ইয়েট্স বা জীবনানন্দের সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা যেন তার কাছে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

শব্দে বিনয় ব্যবহার করেন, তারকা, কুসুম, অঙ্গুরীয়, বাষ্কপ পুঞ্জ, কাঁটায় পরিবেষ্টিত গোলাপ, ব্যর্থ জিহ্বা, নভচর ইত্যাদি। মাসের ক্ষেত্রে এক মাত্র অঘ্রান। ঋতুর ক্ষেত্রে শীত, গ্রীষ্ম, জীবনানন্দ চিত্র কল্প ও উপমায় জোর দিয়েছেন। বিনয় দর্শন ও গণিতকে সঙ্গী করে অগ্রসর হয়েছেন। যুক্তি ও তার এক প্রধান সহায়ক এবং যে কোন বিষয়কে একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রবণতা এবং এগুলিকে সম্বল করে তিনি মূলের দিকে ধাবিত। এভাবে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যদি বিশ্লেষণে যাই, দেখা যাবে বিনয় ও জীবনানন্দের সম্পূর্ণ দুটি আলাদা জগৎ।

তবে একথাও স্বীকার করব যে, তিনি যেমন আমাদের অগ্রজ অর্থাৎ ভারতীয় ক্লাসিক গুলির থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন তেমনি জীবনানন্দের থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যা ব্যক্তিগতভাবে তার সাহচর্যে থাকার ফলে জানতে পেরেছি। এবং তাঁর জীবনানন্দের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাও ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি জীবনানন্দের পংক্তি গড় গড় করে আউড়ে যেতেন। যেমন বলতেন রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, জয়দেব ইত্যাদিদের নানা প্রসঙ্গ। এখন বরং দেখে নেওয়া যাক বিনয়ের কবিতা সম্পর্কে নিজ স্বভাবনা। যে ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার অনুভূতিগুলি জানাবার চেষ্টা করি।

একজন কবি যা দেখেন এবং তাঁর ঐ দেখার ফলে, বস্তুর রূপ, গুণ, আকার, অবস্থান, সময়, আলো ও প্রকৃতিগত সমন্বয়ে, যে প্রতিক্রিয়া তার ভেতরে হয় তার বাক রূপ বহির্প্রকাশই যেন স্ব-ইচ্ছায় কবিতা রূপ নেয়। এই বহির্প্রকাশ দু'ভাবে সম্ভব। যেমন, প্রতিক্রিয়ার চাপ বেশি হলে, অর্থাৎ কবির শারীরিক ও মানসিক শক্তির তুলনায় তা বেশি হলে, সে ক্ষেত্রে কবি ঐ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট বাকরূপ বহির্প্রকাশ শক্তির ইচ্ছায় চালিত হন। আবার কবির শারীরিক ও মানসিক শক্তি, ঐ বাকরূপ বহির্প্রকাশ শক্তির তুলনায় বেশি হলে, কবি তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিজেই পরিচালনা করতে সক্ষম হন। যে শক্তিকে কবি রিলকে কোন এক তরুণ কবিকে লেখা চিঠিতে, যন্ত্রের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রের ভেতর দিয়ে মঙ্গলের দিকে চালিত করার কথা বলেছেন। এই শক্তি নানা ভাবে সৃষ্টি হতে পারে, যা 'শরীরে কী যেন ভর করে' বা লোরকার 'দুয়েন্দে'। মঙ্গলের দিকে চালনা করা কেন? কারণ এ অবস্থায় কবি যা লেখেন তা সত্য হয়ে যায়। বিনয়ের কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে বোঝা যায়, তাঁর এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা ছিল শেষ পর্যন্ত। এ পর্যন্ত এসে আরো একটি কথা তার ক্ষেত্রে বলা যায় কি? তিনি কখনও মনবৈকল্যের শিকার ছিলেন না। তাঁর কবিতা তো বলে দেয়,

সুচিন্তিত দর্শন, প্রেম, প্রকৃতির এই মিশ্রণটি যেন সৃষ্টিকর্তার নিজ হাতে করা। আর গণিত সেখানে, এ মিশ্রণের যথার্থতা যাচাই -এর এক সহায়ক পদ্ধতি ও উপাদান। এই ভাবে চিন্তাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সত্যতা যাচাই করে যা কবিতার রসায়নে ঢুকিয়ে যথার্থ কবিতা করে তুলেছেন। এই কাজটি বিশ্বের অন্য কোন কবি করেছেন কিনা আমার জানা নেই। বিনয় তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে একস্থানে জানিয়েছেন— ''সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভেতরের সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সারসত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম, জড়ের জীবনেও যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব, জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এবং তাদের জীবনের ঘটনাকে মানুষের জীবনের ঘটনা বলেই চালাতে লাগলাম। এই ভাবে সুরু হলো কবিতা জগতে আমার পদযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো চাকা'। ১৯৬০ সাল আমি এইভাবে লিখে কাটালাম।"

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার ধারণা তিনি এই সূত্রটিকে প্রথমে গণিত দ্বারা তার সত্যতা যাচাই করে নিয়েছেন এবং দীর্ঘ দিন এ বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই পদ্ধতি যে ছিল তাঁর অত্যন্ত ব্যক্তিগত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার ধারণা তিনি এই সূত্রটিকে প্রথমে গণিত দ্বারা তার সত্যতাই যাচাই করে নিয়েছেন এবং দীর্ঘ দিন এ বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই পদ্ধতি যে ছিল তাঁর অত্যন্ত ব্যক্তিগত।

এ বিষয়ে মনে পড়ছে তার শেষ দিকের একটি কথা। তিনি জানান — মার্কস - এঙ্গেলসবাদ যে সঠিক তা তাঁরা কয়েক বন্ধু মিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থাকাকালীন গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখেছিলেন। এ -ও জানান এঙ্গেলস একটি কারখানা খুলেছিলেন। তিনি তার শ্রমিকদের উপর দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে এই মতবাদ লিখেছিলেন। অর্থাৎ বিনয় এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং গণিত দ্বারা সত্য প্রমাণিত বিষয়কে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তার পুনর্জন্মের ভাবনাটির কথা উল্লেখ করা যায়। পুনর্জন্ম আছে কি - না, এই ভাবনা তিনি যে করে চলেছেন, এ বিষয়টি আমার চোখে পড়ে আশির দশক থেকে। প্রকৃতির মধ্য থেকে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেরিয়েছেন। অবশেষে লিলি ফুলগাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। যা আমরা পাই ৮৪ সালে প্রকাশিত 'আমাদের বাগানে' নামক কাব্যগ্রন্থে 'পূনর্জন্ম' নামক কবিতার মধ্য দিয়ে—

'বর্ষাকালে লিলি ফুলগাছে খুব ফুল ফুটেছিল।
ফুল ফোটা শেষ হলে বর্ষার শেষের দিকে লিলি ফুলগাছ
গোড়া ঘেঁষে একেবারে কেটে ফেলেছিল, দেখে অবাক হয়েছিলাম আমি।
মাসখানেকর মধ্যে দেখি সেই কেটে ফেলা গোড়া থেকে লিলি ফুল গাছ
ফের গজিয়েছে সেই মাটির ভিতর থেকে সবুজ সুদীর্ঘ পাতাগুলি।
নতুন গজানো এই লিলি ফুল গাছে ফের ফুল হবে আগামী বছর।
এই হলো আমাদের বাগানের লিলি ফুল গাছের জীবনী।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি এই রূপ পুনর্জন্ম এবার বর্ষায়।' ...

যেটি পরবর্তীতে গণিত দিয়ে প্রমাণ করে কবিতা আকারে রেখেছেন। যে গণিতটি এখানে উল্লেখ করা হলো $x\,(-১)^{১}/_{২}$ অর্থাৎ এ মৃতদেহ গুন $(-১)^{১}/_{২}$। এই গণিতটি। এই গণিতটি ভাঙালে পুনর্জন্ম কথাটি বেরিয়ে অসে বলে একজন গণিতবিদ জানান। অতএব, তার এই গণিত ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। না । ঠিক বলা হোলনা। তিনি তো তার এক কবিতায় জানিয়েছেন;

'অনেক কিছুই আছে যা গণিত দিয়ে
সমাধান করা অতীব কঠিন কাজ।
যেমন পরমেশ নামক প্রাণীটি।
পরমেশের উপর কোন দেবতা আছে কি, এই
কথা গণিত দিয়ে সমাধান করা এক দুরূহ ব্যাপার।
নানান জটিলতা দেখা দেয়
গণিত দিয়ে এই ব্যাপার সমাধান করবার বেলায়।
এমতাবস্থায় ব্যাকরণ দিয়ে সমাধান করতে হয়
(অনেক কিছু আছে, আমি গ: শূন্য)

কি এই ব্যাকরণ দিয়ে সমাধানের পদ্ধতি? তিনি তার প্রকাশিত 'আমিই গণিতের শূন্য' নামক কাব্যগ্রন্থের 'আমি এখন' নামক কবিতা তৃতীয় কবিতাটিতে তা জানাতে ভোলেনি।

কারো উপরে কেউ আছে কিনা। জানতে হলে
ব্যাকরণের উপসর্গগুলির দ্বারা জানা সম্ভব।
প্র পরা অপ সম
অনু অব নিব দুর
অভি বি অধি সু
উৎ অতি নি প্রতি
পরি অপি উপ আ
এই কুড়িটি উপসর্গ দ্বারা দেব দেবীদের জন্ম
হয়েছে।

কোন দেবতার নামের উপর কেউ থাকলে
এই দেবতার নামের আগে অধি উপসর্গটি বসে
যেমন অধিপতি, অধিনায়ক, অধিদেবতা
অধিকর্তা অধিরাজ ইত্যাদি। অতএব
পরমেশের উপে দেবতারা অধিপরমেশ।

আমরা এই মুহূর্তেই ফিরে তাকাতে পারি তার 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র দিকে। এখানে তিনি যেন আমাদের ভারতীয় বেদ বা উপনিষদ রচয়িতার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করলেন সেই দর্শন যা সম্পূর্ণ নতুন। এক্ষেত্রে ঐতরেয়েকে মনে করায়। যিনি ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্য প্রকৃতিকে গুরু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই 'অঘ্রানের অনুভূতি মালা' সম্পর্কে' তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করবার জন্য অনেক বিদেশীই বাংলা ভাষা শিখে নিতে শুরু করবে। আরো জানান এই কাব্যটি যদি কোন দার্শনিক আলোচনা করেন, তবে সঠিক হয়। এই কাব্যেই তিনি মহাপয়ারে লিখেছেন। এই মহাপয়ারে পূর্বে অন্য কেউ লিখেছেন কি-না আমার জানা নেই।

বিনয় মজুমদার ছিলেন শুদ্ধ চৈতন্যের কবি। এই কথার সত্যতা যেমন তাঁর সংস্পর্শে থেকে অনুভব করেছি, তেমনি তাঁর কবিতার শরীরেও মেলে। এই বিষয়ে বিনয়ের নিজের উচ্চারণ 'ঈশ্বরী'র কাব্যগ্রন্থে।

চৈতন্যোদয়ের পরে এই বলি, ঈশ্বরী কখনো
স্বর্গে কিম্বা মর্তে যদি কোনো ভুলত্রুটি ক'রে থাকি
তবে তুমি দয়া ক'রে বিনা শর্তে ক্ষমা করো, সখি,
বংশ - বৃদ্ধিকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন এ সকল
বৃক্ষদের প্রতি চেয়ে মানুষের কতা মনে পড়ে।
দেখেছি, মানুষ অর্ধ - সজীব পদার্থমাত্র, তারও
বংশ - বৃদ্ধিকরণের ক্ষমতা রয়েছে, তবে কোনো
আত্মা নেই; এই ভালো। তাহলে তো শুধু তুমি - আমি—
(সর্বদা সত্য অনুরোধ)

কিংবা
আনন্দিত নিয়মেরা, আমাদের ইচ্ছা - অনিচ্ছারা
স্বকীয় মাধ্যমে স্নিগ্ধ ভালোবাসা ব্যক্ত করে যায়—
দেহহীন সব সত্তা, পক্ষপাত প্রতীত তারকারা,
সময় আকাশ আলো ঐশ্বরিক প্রতিভায় জ্বলে,
বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠায়
পৃথিবীতে আজ এক বিস্ময় সঞ্চার ক'রে চলে।
প্রখ্যাত প্রাণীরা দ্রুত লুপ্ত হবে, ঈশ্বরী - ইশ্বর
দুজনে অবোধ্যভাবে নির্ভুল, প্রস্থান চিন্তারত।
(আমাদের দ্বৈতচিন্তা)

এইসব উচ্চারণ সহজেই বলে দেয় তার চৈতন্য প্রাপ্তির কথা, কারণ কোন কবি জাগতিক এই স্তর থেকে চৈতন্যস্তরে পৌঁছাতে না পারলে, মানুষ যে অর্ধসজীব পদার্থমাত্র, বা দেহহীন সব সত্তা পক্ষপাত, প্রীত তারকারা সময় আকাশ আলো ঐশ্বরিক প্রতিভায় জ্বলে, বা বিশ্বের প্রতি বস্তু তাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে আজ এক বিস্ময় সঞ্চার করে চলে। এইসব দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাকে জানাই। দুধরনের কবিতা আছে— প্রথমজন— ঐ চৈতন্য প্রাপ্তির ফলে যার শরীর থেকে উত্থিত হয় কবিতা। এ যেন গাছের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ফুল বা ফল। এগুলি গাছের শরীরের কোথায় তাকে। কিংবা কিভাবে জন্ম নেয়, এবিষয়ে নানা ভাবে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু গাছ এগুলিকে সহজাতভাবে আমাদের দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে গাছের শুদ্ধ চেতনার ফল কিনা জানিনা, কিন্তু এ ভেবে নেওয়া যায় যে পূর্বার্জিত জ্ঞান যা সহজাত তার সত্তায় মিশে বংশানুক্রমে এভাবে তার অবচেতন স্তরের ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট হয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে। তবে কবি কাব্যসাধনায় ক্রমান্বয়ে অনুশীলন দ্বারা প্রাপ্ত মগ্নতা তাকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেটিকে শুদ্ধ স্তর বা চৈতন্যপ্রাপ্তির স্তর বলা যায়। এ স্তরে কবি অবস্থানকালে ঐ গাছের শরীর থেকে ফুল বা ফল জন্মাবার মতো সহজভাবে কবিতা যেন সমস্ত শরীর থেকে কবিতা উত্থিত নেয়। অন্যজন যিনি নির্মাণে বিশ্বাসী। এ যেন তাজমহল নির্মাণ। সুন্দর, তবে ধরে ধরে মাপ - জোক করে নির্মিত। এই দুই ধরনের কবির মধ্যে বিনয় প্রথম উল্লেখিত কবির পর্যায়ে পড়েন। যদি বলা হয়, বিনয়ের কবিতায়ও তো গাণিতিকভাবে, ছন্দ বা তার দর্শনপ্রয়োগ রয়েছে; এক্ষেত্রে বলবো, ফুলের রং, আকার, প্রতিটি একটি গাণিতিক পরিমাপে সৃষ্ট, কিন্তু তা ধরে ধরে হিসাব কষে, রং চাপিয়ে মেপে পাপড়ি বা পরাগ ইত্যাদি বানায়নি কোন মানুষ। এমন যে সৃষ্টি, এর মতোই বিনয়ের কবিতা। যেখানে ক্রমান্বয়ে অনুশীলন ছাড়া এই শুদ্ধচেতনায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আত্মসংযম, ত্যাগ, একনিষ্ঠতা কঠোরভাবেই প্রয়োজন। বহুনিষ্ঠের পক্ষে যা কখনো সম্ভব নয়। এ যেন হেঁটে বা দৌড়ে ট্রেন ধরবার প্রক্রিয়া। প্রথম দিকে কসরত কিন্তু কোন ক্রমে ট্রেনে চাপতে পারলেই গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ ওই স্তরে পৌঁছানো এ ধরনের কবির জরুরি। কবি বিনয় মজুমদার এমন এক স্তরে সর্বদাই অবস্থান করতেন।

পূর্বে উল্লেখিত য়ুরোপীয় বিংশ শতকের কবিদের সঙ্গে যেখানে তার চলার পথে মিল দেখা যায় বলে জানিয়েছি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে মিল দেখিয়েছি, আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে — এই মিলগুলি যে কোন মৌলিক কবির ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব। কারণ বিনয় প্রথমেই যে পথ ১৯৬০ -এ আবিষ্কার করেছিলেন অর্থাৎ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এগোনোর, সেক্ষেত্রে বলবো, তিনি যে চিরস্থায়ী কবিতা লেখার পথে হাঁটতে চেয়েছিলেন, সে পথটি কিন্তু গীতা - বেদ বা উপনিষদ জাতীয় গ্রন্থের স্থায়িত্বের কারণ বিশ্লেষণ করেই পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কোনো একদিনের কথা। আমি তার 'ঈশ্বরী'র কাব্যগ্রন্থটি পড়তে - পড়তে হঠাৎ অনুধাবন করি, এর সঙ্গে গীতার ফর্মের সূক্ষ্ম কোথায় মিল রয়েছে। এ বিষয়ে আমি সরাসরি তাঁর কাছে প্রশ্ন করি — আপনি কি ঈশ্বরীর কবিতাগুলিকে গীতার যে ফর্ম

তা ব্যবহার করেছেন? —বিনয়দা জোরালো গলায় তা অস্বীকার করেন। কেন মনে হয়েছিল আমার? কারণ গীতায় পার্থকে কৃষ্ণ যে সব বিষয় জানাচ্ছেন, বা উপনিষদে যম নচিকেতা কে, সেগুলো সবই তো দর্শন! এক্ষেত্রে বিনয় সখি বা ঈশ্বরী শব্দ দুটি বসিয়ে তার সম্যক জ্ঞানগুলি ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন। সখি বা ঈশ্বরী কেন? কারণ বিনয়, বিশ্বের যেসব কবিতা এ পর্যন্ত টিকে আছে, তাদের বিশ্লেষণ করে যে চারটি উপাদান পেয়েছিলেন, তার ভিতরে প্রেম একটি বিষয়। আমার যা মনে হয়েছে এ ক্ষেত্রে বিনয় দেখেছেন এই চিরস্থায়ী বিষয়টি সখি বা তার আকাঙ্ক্ষিতা ঈশ্বরী ব্যবহার করলে পাঠক মনে প্রেমবোধ আসার ওই ভারি - ভারি দর্শনের ভাবটা কিছুটা হাল্কা করে তোলা সম্ভব।

কিন্তু ''উজ্জ্বল মাছ'' কিংবা ''চাকা''। চাকা কেন? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন তারই শেষ দিককার এক আলোচনার কথা। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানান — তখন আমি রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করছি একটি চিঠি। একজন উপন্যাসিক কোন এক গল্পকারকে লিখছেন, তুমি সবকিছু মানবায়ন করছো কেন? আমি মুহূর্তে ভাবলাম, আমি সব কিছুই মানবায়ন করেই ছাড়বো। উদাহরণ হিসেবে তিনি তাঁর কবিতার লাইন গড়গড় করে বলে যেতে থাকেন—

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো — এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হলো ফল।
(ফিরে এসো চাকা)

কিংবা
ছুটে যাবো যদি শুনি, মিষ্টদ্রব্য স্বগৃহে ফিরেছে।

এরপর তিনি কবিতাপাঠ থামিয়ে জানান, দেখো উজ্জ্বল মাছকে মানবায়ন করে ছেড়েছি এমনকি মিষ্টদ্রব্যকেও। এদিনকার আলোচনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু সখি, ঈশ্বরী, উজ্জ্বল মাছের রূপ নেওয়া বা 'ফিরে এসো চাকা'র 'চাকা' প্রয়োগের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেবের হাত ধরে তার অগ্রজদের ভিতর থেকে পাওয়া 'আরাধনা' থেকে রাধার সামান্য ব্যবহার গীত গোবিন্দে পূর্ণরূপ পেয়েছিল, যার জয়যাত্রা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্র কাব্যে এই রাধা, 'তুমি' হয়ে দেখা দিল। জীবনানন্দ এই 'তুমি' -কে সাদামাটা সমাজের এক রমণী করে দিলেন — বনলতা প্রয়োগে। যা আরো মাত্রা পেল 'সেন' পদবী ব্যবহারে। এই পথে অর্থাৎ ব্যক্তিগত কোন নাম ব্যবহারে এই 'আরাধনা' — রাধা - তুমি - সাধারণ ঘরের রমণী থেকে উন্নীত করে সমস্ত কিছুর মধ্যেই তাকে আরোপ করলেন, যা বাংলা কবিতার আরেক মাত্রা আনলো। অর্থাৎ বিনয়ের কাব্যে রাধা কোন এক-এ বন্দি নন। সে যেন বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে অবস্থানকারিনী। সর্বরূপেই বিরাজিতা। যেখানে এসে সরস্বতী বন্দনা বা চণ্ডী স্তোত্রের সেই নারীকে মনে করায়। বিশ্বরূপে, বিশালাক্ষ্মী বা যা দেবী সর্বভূতেষু...

কিন্তু গায়ত্রী? এ প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি জানান — কবিতা লিখতে গেলে কাউকে না কাউকে নিয়ে লিখতে হয়। তাহলে কি গায়ত্রী এখানে তার ঈপ্সিততে পৌঁছানোর এক মাধ্যম মাত্র। (কিন্তু তাঁকে তো দেখেছি দেহ ত্যাগের কয়েকদিন আগেও এর প্রতি এক টান।) তাঁর এক গদ্যে উপরোক্ত কথাটির সত্যতা অনেকাংশে মেলে। যেখানে তিনি যে পাগল নন, এ বিষয়ে জানাতেও চেষ্টা করেছেন।

সখি প্রতিদিন হায়
এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে
আমার নামটি বসিল নে।

পাঠক, সত্য সত্যই যদি এমন কাণ্ড কেউ করতো — দৈনিক একজন যুবক, যুবতীকে শুধু দেখে ফিরে যেতো। নাম না জানা যুবতীকে শুধু দেখেই ফিরে যেতো, প্রতিদিন। তাহলে সেই যুবককে লোকজন কি বলতো? সুস্থ বলতো কি? তদুপরি সেই যুবতী তার সখির হাতে মাথার একটি কুসুম দিতো, সেই যুবককে দেবার জন্য, তাও না গোপন রেখে তবে সেই যুবতীটিকেই বা কি বলতো?

এরকম কাণ্ড আমি নিজেও করে দেখেছি, পরীক্ষামূলকভাবে। আমাকে কী বলেছেন বাঙালিরা? অথচ রবীন্দ্রনাথের এই গানটিকে বাঙালীরা যত্নের সঙ্গে গায় এবং বলে, এটা একটি প্রেমের সঙ্গীত।

রাকা ভট্টাচার্যকে দেখেই আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম। রাসবিহারী এভেনিউয়ের 'লা কাফে' নামক চায়ের দোকানে বসে। আমার কাছে কাগজও ছিল না, কলমও ছিলনা। এক ভদ্রলোক 'লা কাফে'তে ঢুকলেন, হাত ব্যাগ। তাকে বললাম, ''মহাশয়, আপনার কাছে কাগজ আছে, কলম আছে?'' তিনি বললেন, ''আছে।'' আমি বললাম, ''তাহলে আমাকে একখানা কাগজ ও কলম দিন তো।'' ব্যাস কাগজ আর কলম নিয়ে রাকা-কে নিয়ে একটি কবিতা লিখে তৎক্ষণাৎ ডাক যোগে পাঠিয়ে দিলাম দেশ পত্রিকায়

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানটিতে যা - যা লেখা আছে তাই তা -ই যদি একজন যুবক ও যুবতী করতো দৈনিক, তবে যুবকটিকে অন্তত পাগলাগারদ কিংবা মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন।

আর যিনি ''তার আমার মাথায় একটি কুসুম দে''—লিখেছেন সেই কবিটিকে কী বলতেন জনগণ মন্ত্রীগণ মনস্তত্ত্ববিদগণ? এইসব ভেবে আমি আর প্রেমের কবিতা লিখিনা। তার বদলে জ্যামিতি লিখি। কিমাশ্চর্যম - অতঃপরম - জ্যামিতি লেখা শুরু করার পর আমাকে পাগলের মহৌষধ খাওয়ানো বন্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'সে' নামক বইতে লিখেছেন — রবীন্দ্রনাথকেও পাগলের মহৌষধ খাওয়াতে। তিনি জ্যামিতি জানতেন কি না আমার জানা নেই।

(বহ্নি, সপ্তম বর্ষ, স্বপ্ন সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫, সম্পা: অনির্বাণ রায়চৌধুরী)

এ প্রসঙ্গে আমার সম্পাদিত 'অনুরাধা' -র একটি গদ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই গদ্যটি, রোমান্টিক, প্রেমের কবিতা কতটা জরুরি? সে বিষয়ে তার মতামত জানতে চেয়েছিলাম, এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। রচনাকাল ১৯৯৮।

''প্রেমে না পড়ে কি প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব? আমার মনে হয়, লেখা সম্ভব নয়। একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন অবিবাহিতা মহিলাকে নিয়ে কবিতা লিখলে সেটা সমাজের লোকেরা প্রশংসা করে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'নীরা' -কে পায়নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

লিখেছিলো — 'তাই আমি শেফালীরে ভালবাসিয়াছি।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার নীরাকে বিবাহ করতে পারেনি। তার মানে জনসাধারণ সুনীলের সঙ্গে নীরা-কে বিয়ে দেয়নি। শক্তিও শেফালীকে বিয়ে করতে পারেনি। তার মানে জনসাধারণ শক্তির সঙ্গে শেফালীর বিয়ে দেয়নি।

তা সত্ত্বেও প্রেমের কবিতা কবিরা লেখে। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি।' এই কবিতা রবীন্দ্রনাথ তার বউকে নিয়ে লিখেছিলেন বলে মনে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথ এ-ও লিখেছিলেন 'গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে সুর দিয়েছো তুমি।' একথাও রবীন্দ্রনাথও তার বউকে নিয়ে লিখেছিলেন বলে ধরা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই আরো কবিতা রয়েছে 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু, তোমার পানে।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তার বউকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন সেটা আসলে গোপনে গোপনে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে নিয়ে লেখা পূজার কবিতা হয়ে গেছে। সব কবিরই তাই। প্রেমিকাকে নিয়ে কবিতা লিখছি ভাবতে - ভাবতে যা কবিরা লেখে সেটা কালক্রমে জীবনদেবতাকে নিয়ে লেখা বলে প্রমাণিত হয়। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যত প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন তার সব কবিতাই আসলে আঞ্জেলোর জীবনদেবতাকে নিয়ে লেখা। এমনকি নিসর্গ বর্ণনামূলক যেসব কবিতা অ্যাঞ্জেলো লিখেছিলেন সে কবিতাগুলিও আসলে পূজার-ই কবিতা।

তাই আবার মনে আসে 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু - তোমার পানে।' প্রভু রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু বউকে কি ভালোবাসা যায়? যায় না। ছেলেমেয়েদের কি ভালোবাসা যায়? যায় না। 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা, প্রভু, তোমার পানে।' আবার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'না চাহিতে মোরে যা করেছো দান— আকাশ আলোক তনু মনপ্রাণ...আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, তুমি বঞ্চিত করে 'বাঁচালে মোরে।'

পৃথিবীশুদ্ধ সব প্রেমিকেরই একই দশা। আমি ইচ্ছা করেই কেবলি রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনার কথা লিখলাম। সুতরাং কবিরা প্রেমের কবিতা লিখুন, যার - যার প্রেমিককে নিয়েই লিখুন, এরকম লিখতে হবেই কবিদিগকে। পরে বুড়ো বয়সে দেখবেন সমস্ত প্রেমের কবিতাই কোন যাদু বিদ্যাবলে পূজার কবিতা হয়ে গেছে।

সম্ভবত আশির দশকে আমাকে জানান — 'দেখো ভাই আমাদের যত কবি আদি থেকে এ পর্যন্ত টিকে রয়েছেন, যেমন ধর কালিদাস, জয়দেব, এদের প্রত্যেকেরই একখানি করে আদি রসাত্মক কাব্য আছে। এই উক্তি ধরে আমরা কিন্তু তার আদিরসাত্মক কবিতাগুলি লিখবার কারণ খুঁজে পাই। এই ক্ষেত্রে যে তিনি হাংরি আন্দোলনের দ্বারা কোনভাবে প্রভাবিত ছিলেন না, তা নিশ্চিতভাবে ভাবা যায় কি? তিনি তো 'আত্মপরিচয়' -এ লিখেছেন—

... আশ্চর্যের বিষয়, সমালোচনায় শক্তি লিখলো যে 'হাংরী জেনারেশন' নামে একটি কবিগোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, আমি তার জনক ইত্যাদি - ইত্যাদি। আসল কথা হচ্ছে, ওই সমালোচনা পড়েই আমি ওই জেনারেশনের কথা জানলাম, তার আগে জানতাম না। জেনারেশনের অন্তর্ভুক্ত কারো সঙ্গেই তখন আমার আলাপ ছিল না। দুর্গাপুরে কর্মরত থাকার ফলে কোন দলগঠন ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব। আসল কথা দলগঠন করেছিল শক্তি। তার নিজের কৃতিত্ব আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল কেন, কে জানে।

উপরোক্ত অংশে পাঠে যেমন হাংরী জেনারেশনের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে পড়ে, তেমনি আমাদের সামনে হাজির হয় দুটি শব্দ — 'দল' ও 'গোষ্ঠী'। কবিতা লেখার কালেও যে তার দল বা গোষ্ঠী তৈরি করা সম্ভব ছিল না, একথাও সত্য। কারণ তিনি যে জীবনের সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে একমাত্র কবিতাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। ভিতরে তার ছিল যে অমূল্য মণিমুক্তো। অর্থাৎ ভারতীয় মহাকবিদের বীজ। এই বীজকে প্রকৃত ব্যবহারই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। অতএব কোন দল বা আন্দোলন নয়। নিয়ত অন্বেষণ আর অনুশীলনের দ্বারা সেই স্তরে পৌঁছানো, যেখান থেকে শাশ্বত কবিতা উৎসারিত হয়। তাই ক্রমশ একা হয়ে পড়ে।

বিনয় জানান ------- 'তখন আরো কবিতা পড়ুন' নামক আন্দোলন খুব জোর চলছে। মাঝে - মাঝে রাস্তা দিয়ে চোট মিছিল যেতো। স্লোগান দিতো — 'আরো কবিতা পড়ুন', হাতে থাকতো ফেস্টুন। যতদূর মনে পড়ে তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণ কবিরা বক্তৃতাও দিতো, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। দেখেশুনে আমি বলতাম, 'আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তার মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্র - ছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু এখন আমার কোনো পাঠক না থাকলেও চলে।' এবং কবিবন্ধুদের বললাম যে মিছিল করে কিছু হবে না। আসল কথা হচ্ছে ভালো লেখা দরকার। যখন কবিতার বই ছেপে খাটের নিচে রেখে দেবে, কারো কাছে বেচতে যাবে না, তা সত্ত্বেও পাঠকেরা এসে খাটের নিচের থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়বে তখনই বুঝবে কবিতা ঠিক লেখা হচ্ছে। আমার এ-মন্তব্য কিন্তু কবিবন্ধুদের ভাগো লাগেনি।...

(সাঃ পঃ)

এই গদ্যের সত্যতা আমার নিজের চোখে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁর জীবনের শেষ পর্বের দিকে তাঁর কবিতাগুলি ঘর থেকে মানুষেরা এভাবে নিয়েছেন।

গায়ত্রী চক্রবর্তী কোন এক টি. ভি. সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, আমি তার কবিতা পড়েছি। আমার মনে হয়েছে, 'বিনয় বাংলার দান্তে'। তা হলে কি বিনয় এক্ষেত্রেও ঠিক লিখেছিলেন।

... 'গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খ্রী: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করেছিলো। সে-ই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকে উদ্দেশ্য করে 'গায়ত্রীকে' লেখা।'

অর্থাৎ যে বইটিকে পরবর্তীতে পাই ফিরে এসো চাকা রূপে।

আমি গদ্যের প্রারম্ভেই চাঁদের প্রসঙ্গে বলেছি, চাঁদটাকে যেমন ভালো করে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, তেমনি ভাবে তার কবিতাকেও দেখে নেওয়া দরকার। এ-ও জানিয়েছিলাম, এ কাজ বিজ্ঞজনের। এই গদ্যের উপসংহারে পুনরায় ঐ একই কথা জানাই। কিন্তু বিনয়ের কবিতা পাঠ কালের অন্ধের স্পর্শ ইন্দ্রিয়-এর দ্বারা সৃষ্ট অনুভূতির মতো, তাঁর সম্পর্কিত যে বোধ আমার ভেতরে জন্ম নিয়েছে, তাকে শেষ অংশে এক কথায় প্রকাশ করি, বিনয় শুধু মহাকবি-ই নন, তিনি নতুন বেদের লিপিকারও। আমরা যে তাকে নানভাবে অপচয় করেছি!

কৃতজ্ঞতা

এই গল্পের কপি করে দেবার জন্য গৌরী মৈত্র এবং ঐ গদ্যের জন্য যিনি তাগিদ সৃষ্টি করে লিখিয়ে নিয়েছেন সেই দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়কে।